চাঁদের অমাবস্যা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

চাঁদের অমাবস্যা
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২২

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স দে'জ পাবলিশিং কলেজ স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ২২০ টাকা

Chander Amaboshay by Syed Waliullah Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudra-E-Khuda Road Kantabon Dhaka 1205 Kobi
First Edition: September 2022
Phone: 02223368736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 220 Taka RS: 220 US 12 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-96871-0-8

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

এক

শীতের উজ্জ্বল জ্যোৎস্নারাত, তখনো কুয়াশা নাবে নাই। বাঁশঝাড়ে তাই অন্ধকারটা তেমন জমজমাট নয়। সেখানে আলো-অন্ধকারের মধ্যে যুবক শিক্ষক একটি যুবতী নারীর অর্ধ-উলঙ্গ মৃতদেহ দেখতে পায়। অবশ্য কথাটা বুঝতে তার একটু দেরি লেগেছে, কারণ তা ঝট্ করে বোঝা সহজ নয়। পায়ের ওপর এক ঝলক চাঁদের আলো। শুয়েও শুয়ে নাই। তারপর কোথায় তীব্রভাবে বাঁশি বাজতে শুরু করে। যুবতী নারীর হাত-পা নড়ে না। চোখটা খোলা মনে হয়, কিন্তু সত্যিই হাত-পা নড়ে না। তারপর বাঁশির আওয়াজ সুতীব্র হয়ে ওঠে। অবশ্য বাঁশির আওয়াজ সে শোনে নাই।

কিন্তু কখন সে মৃতদেহটি প্রথম দেখে? এক-ঘণ্টা, দু-ঘণ্টা আগে? হয়তো ইতিমধ্যে এক প্রহর কেটে গেছে, কিন্তু যুবক শিক্ষক সে-কথা বলতে পারবে না। মনে আছে সে বাঁশঝাড় থেকে বেরিয়ে এসেছিল। চতুর্দিকে ঝল্‌মলে জ্যোৎস্নালোক, চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল আলো। তখন সে দৌড়তে শুরু করে নাই। বাঁশঝাড়ের সামনেই পূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে সে তাকে দেখতে পায়। ধীরপদে হেঁটেই যেন সে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, নিরাকার বর্ণহীন মানুষ। হয়তো তার দিকে কয়েক মুহূর্ত সে তাকিয়ে ছিলও। তারপর সে দৌড়তে শুরু করে।

তখন থেকে সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটাছুটি করছে। হয়তো এক প্রহর হলো ছুটাছুটি করছে। চরকির মতো, লেজে কেরোসিনের টিন বেঁধে দিলে কুকুর যেমন ঘোরে তেমনি। কেন তা সে বলতে পারবে না। কেবল একটা দুর্বোধ্য নির্দয় তাড়না বোধ করে বলে দিশেহারা হয়ে অবিশ্রান্তভাবে মাঠে-ঘাটে ছুটাছুটি করে, অফুরন্ত জ্যোৎস্নালোকে কোথাও গা-ঢাকা দেবার স্থান পায় না, আবার ছায়াচ্ছন্ন স্থানে নিরাপদও বোধ করে না। গভীর রাতে এমন দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে পশ্চাদ্ধাবিত অসহায় পশুর মতো সে জীবনে কখনো ছুটাছুটি করে নাই। অবশ্য গ্রামবাসী অনভিজ্ঞ যুবক শিক্ষক বাঁশঝাড়ের মধ্যে যুবতী নারীর মৃতদেহও কখনো দেখে নাই।

তারপর একটি অদ্ভুত কারণেই সে হঠাৎ থেমে একটা আইলের পাশে উবু হয়ে বসে নিঃশব্দ রাতে সশব্দে হাঁপাতে থাকে। ওপরে ঝলমলে জ্যোৎস্না, কিন্তু সামনে নদী থেকে কুয়াশা উঠে আসছে। কুয়াশা না আর কিছু, হয়তো সে ঠিক বোঝে না। হয়তো একদল সাদা বকরি দেখে, যার শিং-দাঁত-চোখ কিছুই নাই। হয়তো মনে হয় রাত্রি গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠে বসেছে, চোখ-ধাঁধানো অন্তহীন জ্যোৎস্নালোকে

জীবনের আভাস দেখা দিয়েছে। হঠাৎ আশ্রয় লাভের আশায় তার চোখ জ্বলজ্বল করতে শুরু করে।

অবশেষে মাঠ-ঘাট কুয়াশায় ঢেকে যায়, ওপরে চাঁদের গোলাকার অস্তিত্বের অবসান ঘটে। কুয়াশায় আবৃত হয়ে যুবক শিক্ষক গুটি মেরে বসে থাকে। হাঁপানি তখন কিছু কমেছে, সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত ভয়টাও যেন পড়েছে কিছু। যেখানে বসেছিল সেখানে বসেই কেবল লুঙ্গি তুলে সরলচিত্তে লাঙল-দেয়া মাঠে সে প্রস্রাব করে। মনে হয় মাথাটা যেন সাফ হয়ে আসছে। বুক থেকে ভারী কিছু নাবতে শুরু করেছে দেখে সহসা মুক্তির ভাব এসে সে থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে, মনে হয় সে কাঁদবে। কিন্তু সে কাঁদে না। চারধারে গভীর নীরবতা। সে নিশ্চল হয়ে মাথা গুঁজে বসে যেন কারো অপেক্ষা করে।

শ্লথগতি হলেও কুয়াশা সদাচঞ্চল। নড়ে-চড়ে, ঘন হয়, হাল্কা হয়। সুতরাং এক সময়ে হঠাৎ চমকে উঠে ওপরের দিকে তাকালে যুবক শিক্ষকের শীর্ণ মুখে এক ঝলক রুপালি আলো পড়ে। স্বচ্ছ-পরিষ্কার আকাশে কুয়াশামুক্ত চাঁদ আবার ঝলমল করে। স্নিগ্ধ প্রশান্ত চাঁদের মুখ দেখে অকারণে সভয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে আবার ছুটতে শুরু করে। ওপরে চাঁদ হেলে-দোলে, হয়তো হাসেও। নির্দয় চাঁদের চোখ মস্ত। যুবক শিক্ষক প্রাণভয়ে ছোটে। যত ছোটে, ততই তার ভয় বাড়ে। সামনে কিছু নাই, তবু দেখে লোকটি দাঁড়িয়ে। দূরে কোথাও একটা কুকুর ডাকতে শুরু করে। তার মনে হয় একটি হিংস্র কুকুর তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বলে। তারপর সে দেখে, বাঁশঝাড়ের সে মৃতদেহটি তার পথ বন্ধ করে লাঙল-দেয়া মাটিতে বাঁকা হয়ে শুয়ে আছে। অর্ধ-উলঙ্গ দেহে প্রাণ নাই তবু একেবারে নিশ্চল নয়। কোথায় যাবে যুবক শিক্ষক? তার হিমশীতল শরীর নিশ্চল, শীর্ণমুখে চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

আবার যখন সে দৌড়তে শুরু করে তখন কিছু দূরে গিয়ে মাটির দলায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে। মুখ থেকে একটা ক্ষুদ্র কিন্তু তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বের হয়। তারপর মাটিতে মুখ গুঁজে সে নিস্তেজভাবে পড়ে থাকে। শীঘ্র তার পিঠ শিরশির করে ওঠে। পিঠে সাপ চড়েছে যেন। বুকে হাতুড়ি পেটা শুরু হয়, অবাধে ঘাম ছোটে। সে বুঝতে পারে লোকটি দাঁড়িয়ে তারই পিঠের ওপর। মুখ না তুলেই দেখতে পায় তাকে : বিশালকায় দেহ, তার ছায়াও বিশালাকার। যুবক শিক্ষক এবার নিতান্ত নিঃসহায় বোধ করতে শুরু করে। জীবনের শেষ মুহূর্তে দেহ গলে যায়, সর্বশক্তির অবসান ঘটে। আর কিছু করবার নাই বলে সে অপেক্ষা করে। সময় কাটে। আরো সময় কাটে, কিন্তু কিছুই ঘটে না। অবশেষে এক সময়ে পিঠ থেকে সাপ নাবে, বিশালাকার ছায়াও সরে যায় এবং যুবক শিক্ষকের নাকে মাটির গন্ধ লাগে। মাথা তুলে সে ধীরে-ধীরে এধার-ওধার তাকায়, বাঁ-দিকে, ডান-দিকে। কুয়াশা নাই। জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিত ধবধবে মাঠে কেউ নাই। দূরে একটা কুকুর বেদনার্ত কণ্ঠে আর্তনাদ করে। তাছাড়া চারধার নিঃশব্দ। একচোখা চাঁদ সহস্র চোখে জনশূন্য পথপ্রান্তর পর্যবেক্ষণ করে। চাঁদ নয়, যেন সূর্য।

হাঁটুতে ভর করে যুবক শিক্ষক উঠে বসে, মুখ বিষাদাচ্ছন্ন। আলোয়ান দিয়ে মুখের ঘাম মোছে, চোখের উদ্‌ভ্রান্তি কাটে। কেবল থেকে-থেকে নিচের ঠোঁটটা থরথর করে কাঁপে। অনেকক্ষণ সে বসে থাকে নতমুখে। আবার যখন সে মুখ তোলে তখন কুয়াশার পুনরাগমন হয়েছে। সে-কুয়াশা ভেদ করে কেমন অহেতুক, উদ্দেশ্যহীনভাবে সে তাকাবার চেষ্টা করে। চোখে এখন নিস্তেজ ভাব, মনের ভয়টাও যেন দূর হয়েছে। তারপর আবার সে তাকে দেখতে পায়। একটু দূরে বটগাছ, আবছা-আবছা চোখে পড়ে। শিকড়ে-শিকড়ে দৃঢ়বদ্ধ গাছটি অস্পষ্ট আলোয় ভাসে, যেন পানিতে আমজ্জ হয়ে আছে গাছটি। যুবক শিক্ষক বারকয়েক মাথা নাড়ে। বটগাছের পাশেই ছায়ার মতো সে দাঁড়িয়ে। জট নয় শাখা নয়, সে-ই দাঁড়িয়ে। এখন আবছা দেখালেও সে আর নিরাকার বর্ণহীন মানুষ নয়।

আবার কী ভেবে যুবক শিক্ষক মাথা নাড়ে। তার মনে গভীর অবসাদ, কিন্তু আর ভয় নেই যেন। যে-মানুষ নিদারুণ ভয়ে বিকৃতমস্তিষ্কের মতো দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে এতক্ষণ ছুটাছুটি করেছিল, সে-মানুষ এখন ভয়মুক্ত। বটগাছের পাশে ছায়াটিকে তার আর ভয় নাই।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সে ঘরাভিমুখে হাঁটতে শুরু করে। সবুজ আলোয়ানে আবৃত তার শীর্ণ শরীর দীর্ঘ মনে হয়, পদক্ষেপে অসীম দুর্বলতার আভাস দেখা গেলেও তাতে সংকোচ-দ্বিধা নাই। তার অনভিজ্ঞ মনে নিদারুণ আঘাতের ফলে যে-প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধতার সৃষ্টি হয়েছিল, সে-বিক্ষুব্ধতা বিদূরিত হয়েছে।

কোনোদিকে না তাকিয়েই সে দ্রুতপদে হাঁটতে থাকে। সে আর ভাবে না। ভাবতে চেষ্টা করলেও তার ভাবনা ধরবার কিছু পায় না। বৃহৎ গহ্বরে ধরবার কিছু নাই।

ঘরে ফিরে পাথরের মতো প্রাণহীন শরীরের ওপর কাঁথা টেনে সে নিঃসাড় হয়ে শুয়ে থাকে। গভীর রাতে কোথাও কোনো শব্দ নাই। শব্দ হলেও তা তার কানে পৌঁছায় না। অন্ধকারের মধ্যে তার দৃষ্টি খুলে থাকলেও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষীণতম শব্দও পাওয়া যায় না। তাছাড়া মনে হয়, সে যেন কারো অপেক্ষা করে।

কীভাবে রাত্রির অত্যাশ্চর্য ঘটনাটি শুরু হয়?

তখন বেশ রাত হয়েছে। শারীরিক প্রয়োজনে ঘুম ভাঙলে যুবক শিক্ষক আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। শীতের গভীর রাত, কেউ কোথাও নাই। ঘরের পেছনে জামগাছ। তারই তলে শারীরিক প্রয়োজন মিটিয়ে সে ঘরে ফিরবে কিন্তু আলোয়ানটা ভালো করে জড়িয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকল। তখন চোখের ঘুমটা কেটে গেছে। যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল সেখানে ছায়া, কিন্তু চতুর্দিকে জ্যোৎস্নার অপরূপ লীলাখেলা।

তখনো কাদের বড়বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে নাই। অন্য এক কারণে যুবক শিক্ষক জামগাছের তলে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

সে-কারণটি হয়তো নেহাতই বালসুলভ। কিন্তু শিক্ষকতা করে বলে তার বাহ্যিক আচরণ-ব্যবহার বয়স্থব্যক্তির মতো হলেও তার মনের তরুণতা এখনো বিলুপ্ত হয় নাই। বরঞ্চ স্বল্পভাষী যুবক শিক্ষকের মনের অন্তরালে নানারকম স্বপ্ন-বিশ্বাস এখনো জীবিত। সুযোগ-সুবিধা পেলে তার পক্ষে স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করা কষ্টসাধ্য নয়। তবে এ-সব সে গোপনই রাখে। তাছাড়া, মনের কথা ঠাট্টা করেও বলবে এমন কোনো লোক সে চেনে না।

জামগাছের তলে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিত রাতের প্রতি তার অদমনীয় আকর্ষণ। শুধু তার রূপেই যে সে মোহিত হয়, তা নয়। তার ধারণা, চন্দ্রালোকে যে-অপরূপ সৌন্দর্য বিকাশ পায় তা উদ্দেশ্যহীন নয়, মূক মনে হলেও মূক নয়। হয়তো সে-সময়ে, যখন মানুষ-পশুপক্ষী নিদ্রাচ্ছন্ন, তখন বিশ্বভূমণ্ডল রহস্যময় ভাষায় কথালাপ করে। সে-কথালাপের মমার্থ উদ্ধার করা মানুষের পক্ষে হয়তো অসম্ভব, কিন্তু তা শ্রবণাতীত নয় : কান পেতে শুনলে তা শোনা যায়। বালকবয়সে পরপর তিন বছর লায়লাতুলকদরের রাতে যুবক শিক্ষক সমস্ত রাত জেগেছিল এই আশায় যে, গাছপালাকে ছেজ্‌দা দিতে দেখবে। গাছপালার এমন ভক্তিমূলক আচরণে আজ তার বিশ্বাস নাই, কিন্তু রাত্রি জাগরণের ফলে তার মনে যে-নতুন ধারণার সৃষ্টি হয় সে-ধারণা এখনো সে যেন কাটিয়ে উঠতে পারে নাই। এত সৌন্দর্য কি আদ্যোপান্ত অর্থহীন হতে পারে? এমন বিস্ময়কর রূপব্যঞ্জনার পশ্চাতে মহারহস্যের কিছুই কি ইঙ্গিত নাই? তাতে মানুষের মনে যে-ভাবের উদয় হয়, সে-ভাব কি সৃষ্টির মহানদীর তরঙ্গশীকরজাত নয়? মনঃপ্রাণ সম্পূর্ণভাবে নিঃশব্দ করে শুনলেই নিঃসন্দেহে অশ্রোতব্য শ্রোতব্য হবে।

চন্দ্রালোকের দিকে তাকিয়ে যুবক শিক্ষক হয়তো বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ নির্জন রাতে চলনশীল কিছু দেখতে পেলে প্রথমে সে চমকে ওঠে। তারপর সে তাকে দেখতে পায়। বড়বাড়ির কাদেরকে চিনতে পারলে তার বিস্ময়ের অবধি থাকে না। চন্দ্রালোক-উদ্ভাসিত এ-মায়াময় রাতে কাদেরের আকস্মিক আবির্ভাব তার কাছে হয়তো অজাগতিক এবং রহস্যময়ও মনে হয়। এত রাতে এমন দ্রুতগতিতে কোথায় যাচ্ছে সে?

তখন যুবক শিক্ষকের চোখ জ্যোৎস্নায় ঝলসে গেছে, তাতে ঘুমের নেশা পর্যন্ত নাই। দ্রুতগামী কাদেরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটি ঝোঁক চাপে তার মাথায়। সে ঠিক করে, তাকে অনুসরণ করবে।

মনে মনে ভাবে, দেখি কোথায় যায় কাদের। বড়বাড়ির দাদা সাহেব বলেন, কাদের দরবেশ। দেখি রাতবিরাতে কোথায় যায় দরবেশ।

তখন কাদের বেশ দূরে চলে গেছে। জামগাছের ছায়া থেকে বেরিয়ে যুবক শিক্ষক তাকে অনুসরণ করতে শুরু করে।

ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় কাউকে অনুসরণ করা সহজ নয়। যুবক শিক্ষককে দূরে-দূরে গা-ঢাকা দিয়ে চলতে হয়। ধরা পড়বার ভয় ছাড়া একটা লজ্জাবোধও তার

চলায় বাধাসৃষ্টি করে। ফলে শীঘ্র দ্রুতগামী কাদেরকে সে হারিয়ে ফেলে। খাদেম মিঞার ক্ষেত পার হয়ে গাঁয়ে আবার প্রবেশ করে দেখে, কোথাও কাদেরের কোনো চিহ্ন নাই। একটু পরে চৌমাথার মতো স্থানে এসে সে হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে পড়ে। কোন দিকে যাবে? চারপথের একটি যায় নদীর দিকে, আরেকটি গ্রামের ভেতরে। তৃতীয় পথ সদ্যতৈরি মসজিদের পাশ দিয়ে গিয়ে বাইরে সরকারি রাস্তার সঙ্গে মিলিত হয়। শেষটা যায় তারই ইস্কুল পর্যন্ত। যুবক শিক্ষক পথনির্দেশ পাবার আশায় কান খাড়া করে শোনবার চেষ্টা করে, কিন্তু কোনো পদধ্বনি শুনতে পায় না। কাদের যেন চন্দ্রালোকে এক মুঠো ধুঁয়ার মতো মিলিয়ে গেছে।

চৌমাথায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে স্থির করে, ঘরে ফিরে যাবে। ভাবে, লোকটা যে কাদেরই সে-কথা সঠিকভাবে সে বলতে পারে না, চোখের ভুল হয়ে থাকতে পারে। তাকে মুখামুখি দেখে নাই, কেবল তার পেছনটাই দেখেছে। ভুল হতে পারে বইকি।

কিন্তু যুবক শিক্ষক ফিরে যায় না। কাদেরকে সে সামনাসামনি দেখে নাই বটে কিন্তু তার হাঁটার বিশেষ ভঙ্গি, ঘাড়ের কেমন উঁচু-নিচু ভাব, মাথার গঠন ইত্যাদি দেখেছে। ভুল অবশ্য হতে পারে, কিন্তু আরেকটু দেখে গেলে ক্ষতি কী? মানুষটি অদৃশ্য হয়ে গেলে তার সম্বন্ধে কৌতূহলটা আরো বাড়ে যেন। কিন্তু কোন দিকে যাবে? চারটা পথের কোনটা ধরবে? কাদেরের রাত্রিভ্রমণের উদ্দেশ্য যখন সে জানে না তখন কোনো একটি পথ ধরার বিশেষ কারণ নাই। তাই অনির্দিষ্টভাবে চারটি পথের একটি পছন্দ করে সে আবার হাঁটতে শুরু করে। কিছুক্ষণ সে কান খাড়া করে রাখে, ঘন-ঘন তাকায় এধার-ওধার। কিন্তু তার সন্ধানকার্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। শীঘ্র সে ভুলে যায় তার চলার উদ্দেশ্য। তার ঘরের পেছনে যে-অপরূপ চন্দ্রালোক তাকে বিমুগ্ধ করেছিল, সে-চন্দ্রালোক এখনো মাঠে-ঘাটে গাছপালা-ঝোপঝাড়ে মানুষের বাসগৃহে মোহ বিস্তার করে আছে। পরিচিত দুনিয়ায় অজানা জগতের মায়াময় স্পর্শ। চন্দ্রালোক-উদ্ভাসিত গভীর রাতে যুবক শিক্ষক একাকী ঘুরে বেড়ায় নাই অনেকদিন। কাদেরের কথা তার মনে থাকলেও তাকে অনুসরণ করার প্রয়োজন সে আর বোধ করে না।

তারপর একসময়ে একটি গৃহস্থবাড়ির কাছে দেখে, পোঁতা খুঁটির মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে কাদের। তার দেহে সহসা কেমন চঞ্চলতা আসে। মনে হয় সে হাসছে। তারই দিকে তাকিয়ে সে হাসছে এবং গা-ঢাকা দেবার কোনোই চেষ্টা নাই।

হঠাৎ ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জা হলে যুবক শিক্ষক সজোরে বলে ওঠে,

'কী ব্যাপার?'

কোনো উত্তর দেয় না।

তারপর কেমন সন্দেহ হলে এগিয়ে দেখে, ভিটেবাড়ির পাশে মূর্তিটি কলাপাতা মাত্র, চাঁদের আলোয় মানুষের রূপ ধারণ করেছে। চাঁদের আলো জাদুকরী, মোহিনী।

যুবক শিক্ষকের বুক সামান্য কাঁপতে শুরু করেছিল। এবার কিছুক্ষণ অনির্দিষ্টভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সে স্থির করে ঘরে ফিরে যাবে। মুখে তখনো লজ্জার ঝাঁঝ। সে ঘরাভিমুখে রওনা হয়। তবে সোজাপথ না ধরে একটু বাঁকাপথ ধরে। সোজাপথ ধরলে অসাধারণ দৃশ্যটি তাকে দেখতে হতো না।

গ্রামের ভেতরের পথটা এড়িয়ে সে নদীর দিকে চলতে শুরু করে। কাদেরকে সে আর অনুসরণ করছে না, সে-বিশ্বাসে তার কথা ভুলতে তার দেরি হয় না। তাকে কলাগাছে রূপান্তরিত করে সে আবার চন্দ্রালোক-উদ্ভাসিত বিস্ময়কর জগতের নেশায় আত্মভোলা হয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে চলতে থাকে : পদক্ষেপে কোনো তাড়া নাই, তার শীর্ণমুখ আবেশাচ্ছন্ন।

গ্রামের প্রান্তে নদীর ধারে একটু বাদাড়-ঝোপঝাড় পাঁচমেশালী গাছপালা, একটা প্রশস্ত বাঁশবন। তারপর ঢালা ক্ষেত। শস্যকাটা শেষ, স্থানে-স্থানে লাঙল-দেয়া হয়েছে।

সে-জঙ্গলের পাশে পৌঁছে খোলা মাঠের দিকে তাকিয়ে যুবক শিক্ষক একটু দাঁড়িয়েছে, এমন সময় একটা আওয়াজ তার কানে পৌঁছায়। আওয়াজটা যেন বাঁশবন থেকে আসে। সেখানে কে যেন চাপা ভারীকণ্ঠে কথা বলছে।

আশপাশে বাসাবাড়ি নাই। অকারণে যুবক শিক্ষক এধার-ওধার তাকায়, এক মুহূর্তের জন্যে তার মনে হয় নদীর বুক থেকে জেলেদের কণ্ঠস্বরই শুনতে পাচ্ছে সে। কিন্তু অবশেষে তার সন্দেহ থাকে না, বাঁশঝাড়ের মধ্যেই কেউ কথা বলছে। শ্রোতা থাকলেও তার গলার আওয়াজ শোনা যায় না : বক্তার শ্রোতা যেন বাঁশঝাড়ই। রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে সে-কণ্ঠ অশরীরী মনে হয় যুবক শিক্ষকের কাছে। তারপর কাদেরের কথা তার স্মরণ হয়।

এবার অদম্য কৌতূহল হলে যুবক শিক্ষক বাঁশঝাড়ের দিকে কয়েক পা এগিয়ে যায়। অল্পক্ষণের জন্যে কণ্ঠস্বর থামে বলে সে সামান্য নিরাশ বোধ করে। শীঘ্র কণ্ঠস্বরটি সে আবার শুনতে পায়। ঈষৎ হেসে এবার সে সজোরে বলে ওঠে, “কাদের মিঞা! বাঁশঝাড়ে কাদের মিঞা!”

কথাটা সজোরে বলেছে কি বলে নাই, অবশ্য সে-বিষয়ে এখন সে হলফ করে কিছু বলতে পারে না। নিঃশব্দ গভীর রাতে এ-সব ব্যাপারে কে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হতে পারে? তখন মনে-বলা কথাই সশব্দে বলা কথার মতো শোনায়। কিন্তু বাঁশবনের আকস্মিক নীরবতার কারণ শুধু তা নয়। কাদেরের কথা শোনবার জন্যে কৌতূহলী হয়ে যুবক শিক্ষক আবার যখন এগিয়ে যায়, তখন একরাশ শুকনো পাতায় তার পা পড়লে নীরবতার মধ্যে সহসা অকথ্য আওয়াজ হয়। সে-আওয়াজে চমকে উঠে সে নিজেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ভয় কাটলে কান পেতে শোনে, কিন্তু বাঁশঝাড়ের নীরবতা এবার অখণ্ডিত থাকে।

সে-নীরবতার মধ্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর যুবক শিক্ষক ভাবে, হয়তো সবটাই মনের খেয়াল। একবার হেসে মনে-মনে বলে, কলাপাতা যদি মানুষ হতে পারে, বাঁশঝাড়ের সংগীত মানুষের কণ্ঠ হতে পারে না কেন?

তবে কথাটা নিজেরই কাছে যুক্তিসংগত মনে হয় না। হাওয়া ছাড়া বাঁশবনে সংগীত কী করে জাগে?

কিছুটা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর হয়তো মনে ভয় এলে হঠাৎ সে অকারণে হাততালি দিয়ে রাখালের মতো গরু-ডাকা আওয়াজ করে ওঠে। পরক্ষণেই বাঁশবনে একটা আওয়াজ জাগে : সেখান থেকে তার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি আসে যেন। না, আওয়াজটা অন্য ধরনের। একটি মেয়েমানুষ যেন সভয়ে চিৎকার করে ওঠে।

আওয়াজটা কিন্তু জেগে উঠেই আবার নীরব হয়ে যায়। কেউ যেন তা পাথর-চাপা দেয়। সাপের মুখগহ্বরে ঢুকে ব্যাঙের আওয়াজ যেন হঠাৎ থামে, বা মস্তক দেহচ্যুত হলে মুখের আওয়াজ যেন অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়। দেহচ্যুত মাথা এখনো হয়তো আর্তনাদ করছে কিন্তু তাতে আর শব্দ নাই। চারধারে আবার অখণ্ড নীরবতা।

রুদ্ধনিশ্বাসে যুবক শিক্ষক দাঁড়িয়ে থাকে, দৃষ্টি নিশ্চল-নিঃশব্দ বাঁশঝাড়ের ওপর নিবদ্ধ। তারপর তার বুক কাঁপতে শুরু করে, ক্রমশ হাতে-পায়ে সারা শরীরেও কাঁপন ধরে। অবশেষে পায়ের তলে মাটি কাঁপতে শুরু করে, জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিত আকাশও স্থির থাকে না। শুধু বাঁশঝাড় নিশ্চল, নিস্তব্ধ হয়ে থাকে।

অনেকক্ষণ পর পৃথিবীব্যাপী কম্পন থামলে ডুবতে-ডুবতে বেঁচে-যাওয়া মানুষের মতো ঝোড়ো-বেগে নিশ্বাস নেয় যুবক শিক্ষক। তারপর হয়তো সাহসের জন্যে ওপরের দিকে তাকায় কিন্তু চাঁদের মায়াময় হাস্যমুখ দেখতে পায় না। সে কিছুই বুঝতে পারে না বলে অবশ দেহে আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

অবশেষে যুবক শিক্ষকের মনে ভয় কাটে। এবার সে নির্ভয়ে চারধারে তাকিয়ে দেখে। না, জ্যোৎস্নারাতে কোনো তারতম্য ঘটে নাই। স্বচ্ছ আকাশে নীলাভা, চাঁদ তাতে রানীসম। তার হাস্যোজ্জ্বল মুখ ঝকঝক করে। অপরিসীম তৃপ্তির সঙ্গে সে ভাবে, না, জ্যোৎস্নারাতের জাদুমন্ত্রের শেষ নাই। চাঁদ মোহিনীময়। আওয়াজটি কানেরই ভুল হবে। এমন ঝকঝকে চন্দ্রালোকিত রাতে কিছুই বিশ্বাস হয় না। যুবক শিক্ষক বাঁশঝাড়ের দিকে চেয়ে পরিষ্কার গলায় ডাকে, “কে?” অবশ্য কোনো উত্তর আসে না। হাওয়ায় বাঁশঝাড়ে সংগীতের ঝংকার জাগে, কিন্তু মানুষের কণ্ঠ, জাগে না। শীতের জমজমাট রাতে একটু স্পন্দনও নাই।

এক মুহূর্ত আগে যা সত্য মনে হয়েছিল, তা যে সত্যই সে-কথা কে বলতে পারে? সত্য চোখ-কানের ভুল হতে পারে, সত্য আবার চোখে-কানে ধরা না-ও দিতে পারে। এবার নির্ভয়ে এবং কিছুটা কৌতূহলশূন্যভাবে যুবক শিক্ষক বাঁশঝাড়ের দিকে এগিয়ে যায়। হঠাৎ মনে হয় সেখানে আবার একটু আওয়াজ হয়, অস্পষ্ট পদধ্বনির মতো : কে যেন সেখান থেকে সরে যাচ্ছে। কিসের আওয়াজ? সঠিক করে বলা শক্ত। সামান্য হাওয়ায় বাঁশবনে শব্দ হয়। কিন্তু হাওয়া নাই। তাহলে জন্তু-জানোয়ারই হবে। শেয়াল কিংবা মাঠালী ইঁদুর। জঙ্গলে সর্বত্র শুষ্ক

পাতা ছড়িয়ে আছে। একটুতেই শব্দ হয়। নির্ভয়ে যুবক শিক্ষক এগিয়ে যায়। অনভিজ্ঞ সরলচিত্ত যুবকের মনের আকাশে কোনো বিপদাশঙ্কার আভাস নাই, ভয়-দ্বিধা নাই। ওপরে, স্বচ্ছ আকাশে সুন্দর উজ্জ্বল মায়াময়ী চাঁদ নির্ভয়ে একাকী বিরাজ করে। একটু ঝুঁকে সে একটা পড়ন্ত শাখা তুলে নেয়। তার তরুণ মুখে একটু কৃত্রিম আশঙ্কা, কৌতুকে মেশানো আশঙ্কা। ভাবে, সাপখোপও হতে পারে, এমন দুঃশীল সাপ যে দারুণ শীতেও গর্তে আশ্রয় নেয় নাই। হাতে গাছের শাখাটি শক্ত করে ধরে যুবক শিক্ষক বাঁশঝাড়ের দিকে এগিয়ে যায়, সাপ না হোক অন্ততপক্ষে দুষ্ট ছাত্রকে শাসন করতে যায় যেন।

জন্তু-জানোয়ার নয়, সাপখোপ বা মাঠালী ইঁদুর নয়, কোনো পলাতক দুষ্ট ছাত্রও নয়। বাঁশঝাড়ের মধ্যে আলো-আঁধার। সে আলো-আঁধারের মধ্যে একটি যুবতী নারীর মৃতদেহ। অর্ধ-উলঙ্গ দেহ, পায়ের কাছে এক ঝলক চাঁদের আলো।

গভীর রাতে বাঁশঝাড়ের মধ্যে আলুথালু বেশে মৃতের মতো পড়ে থাকলেই মানুষ মৃত হয় না। জীবন্ত মানুষের পক্ষে অন্যের জীবন সম্পর্কে নিরাশ হওয়াও সহজ নয়। যুবক শিক্ষক কয়েক মুহূর্ত মৃত নারীর দিকে চেয়ে থাকে। তারপর একটা বেগময় আওয়াজ বুকের অসহনীয় চাপে আরো বেগময় হয়ে অবশেষে নীরবতা বিদীর্ণ করে নিষ্ক্রান্ত হয়। হয়তো সে প্রশ্ন করে কিছু, হয়তো কেবল একটা দুর্বোধ্য আওয়াজই করে : তার স্মরণ নাই। তবে এ-বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ যে সে কোনো উত্তর পায় নাই। মৃত মানুষ উত্তর দেয় না।

যুবক শিক্ষক বাঁশঝাড় থেকে যখন বেরিয়ে আসে তখন তার দৃষ্টিতে ইতিমধ্যে বিভ্রান্তির ছাপ দেখা দিয়েছে, শরীরেও কাঁপন ধরেছে। নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করে সে দ্রুতপদে হাঁটতে থাকে। কিছুদূর গিয়ে সচকিত হয়ে দেখে, সামনে কাদের। সে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠেছে। দেহ নিশ্চল, মুখে চাঁদের আলো। তাকে দেখে ক্ষণকালের জন্যে সে স্বস্তিই বোধ করে। কাছে গিয়ে সে কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থাকে, কিছু একটা বলবেও মনে হয়। কাদের পূর্ববৎ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। মুখে চাঁদের আলো তবু তার চোখ দেখা যায় না।

তারপর হঠাৎ যুবক শিক্ষকের মাথায় বিপুলবেগে একটা অন্ধ ঝড় ওঠে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে বুঝতে পারে না কী করবে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে শুরু করে। তার সমস্ত চিন্তাধারা যেন হঠাৎ বিচিত্র গোলকধাঁধায় ঢুকেছে এবং সে-গোলকধাঁধা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সে দৌড়তে শুরু করে। কিন্তু কোথাও মুক্তিপথের নির্দেশ দেখতে পায় না। সে দৌড়তেই থাকে। যুবক শিক্ষক জ্যান্ত মুরগি-মুখে হাল্কা তামাটে রঙের শেয়াল দেখেছে, বুনো বেড়ালের রক্তাক্ত মুখ দেখেছে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট মহামারি-হাহাকার দেখেছে, কিন্তু কখনো বিজন রাতে বাঁশঝাড়ের মধ্যে যুবতী নারীর মৃতদেহ দেখে নাই। হত্যাকারী দেখে নাই। সে ছুটতেই থাকে।